পিতরৌ বন্দে

প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণা

কবি কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যের সূচনায় আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে প্রণতি জানিয়েছেন :

''বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ॥''

নিখিল জীবজগতের 'পিতরৌ'—পিতামাতা—পার্বতী-পরমেশ্বরকে বন্দনা করি। শব্দ ও তার অর্থ যেমন চিরসম্পৃক্ত—এককে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনই এঁরা স্বরূপত এক, অভিন্ন। শিবভক্ত কালিদাস পার্বতী-পরমেশ্বরের কথা বলেছেন। একইভাবে শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধা, রামচন্দ্র ও সীতাদেবী—সর্বত্রই সগুণ ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি এক, অভিন্ন। এযুগে সেই পূর্ণব্রহ্ম সগুণ, সাকার রূপ নিয়ে আবার এসেছেন ধূলিধূসর ধরণীতে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামে তিনি সর্বজনপূজ্য। সঙ্গে এনেছেন তাঁর শক্তি মা সারদাকে, নরেন্দ্র, রাখাল প্রমুখ পার্ষদ-পরিকরকে।

মানুষের দেহ ধরে যখন অবতরণ করেন তখন ঈশ্বরকে আমরা বলি 'অবতার'। অবতারতত্ত্ব প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ''অবতারকে দেখাও যা ঈশ্বরকে দেখাও তা। ঈশ্বরই যুগে যুগে মানুষরূপে অবতীর্ণ হন।'' অবতরণের একটা ঘোষিত দায় আছে—দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ধর্মসংস্থাপন ইত্যাদি। এ জগৎসংসার তাঁরই সৃষ্টি। অধর্মের প্রাবল্যে সৃষ্টি যখন 'যায় যায়' তখন তিনিই অবতীর্ণ হয়ে মানুষকে সঠিক পথের নির্দেশ দেন, সৃষ্টি রক্ষা করেন।

পৌরাণিক যুগে এমন কত অসুরনিধনের কথা বিচিত্র কাহিনির আকারে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা বলব আধুনিক যুগে অসুর তার অস্তিত্ব কায়েম করেছে মানুষের অন্তরে। কাম, ক্রোধ, লোভের উদগ্র প্রকাশের মধ্যে মানুষের সেই আসুরিক ভাবই কি প্রকট হয়ে ওঠে না? তাদের দমন করতে হলে চাই দৈবী শক্তি, শুভ বুদ্ধি, সৎ সাহস। এসব সদ্‌গুণও মানুষেরই মধ্যে আছে। অবতার এবং তাঁর অন্তরঙ্গদের ভাববলয়ের মধ্যে মানুষ যখন এসে পড়ে তখন সে অতিসহজেই আসুরিক ভাবগুলি অতিক্রম করতে পারে। আমরা যে এযুগে জন্মে ঠাকুর-মা-স্বামীজী এবং ঠাকুরের পার্ষদদের উন্নত জীবন ও চিন্তার সান্নিধ্য পাচ্ছি, এটাই মস্ত লাভ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা তাঁদের পাবনী শক্তি দিয়ে আর্ত, জিজ্ঞাসু মানুষদের উদ্ধার করে চলেছেন।

ভাগবত বলছেন, একটা মজা হল, অবতার যখন 'মানুষং দেহমাশ্রিতঃ ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ'—মানুষের দেহ নিয়ে হুবহু সাধারণ মানুষের মতোই সুখ-দুঃখ অনুভব করেন, তখন সাধারণ লোকেরা তাঁকে অবজ্ঞা করে, আর সকলের মতোই সামান্য বলে ভাবে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আমরা দেবলীলার চমৎকার উদাহরণ পাই। দেবী একে একে অসুরসংহার করে দেবকুলকে রক্ষা করছেন। নরলীলা আরও উপভোগ্য। সেখানে ভগবান মানুষ হয়ে এসে মানুষেরই মতো হাসছেন, কাঁদছেন, ভয় পাচ্ছেন, আবার তারই মধ্যে দেবভাবের চকিত স্ফুরণ হচ্ছে, নিজের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছেন। এমনই মাধুর্যময় লীলা এবার শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীসারদার। এমন অনেক ভক্ত আছেন যাঁরা ঠাকুর ও মাকে সাক্ষাৎ ভগবান-ভগবতীজ্ঞানে পূজা

করেন, তাঁদের কাছেই অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা জানান। তত্ত্বকথায় তাঁদের আগ্রহ কম, বিশ্বাসই তাঁদের মূলধন। এই শ্রেণির ভক্তেরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য নিয়ে মাথা ঘামান না—তাঁর স্মরণ-মননেই আনন্দ পান। কবিগুরুর গানের সেই পঙ্‌ক্তিটি মনে পড়ছে : 'জানি না তোর ধনরতন/ আছে কি না রানীর মতন/ শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়/ তোমার ছায়ায় এসে।"

আর এক শ্রেণির ভক্ত আছেন যাঁরা দেবতার স্বরূপ জানতে উৎসুক। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মেধস মুনির কাছে যেমন প্রশ্ন করা হয়েছে : ''ভগবন্ কা হি সা দেবী'। যুগে যুগে জিজ্ঞাসুচিত্তে এ-প্রশ্ন উঠেছেই।

আমরা 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' প্রভৃতি থেকে যে-বর্ণনা পাই তাতে মনে হয়, অবতীর্ণ ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ যতই রূপ ঢেকে আসুন, যতই বলুন না কেন যে, বাউলের দলের মতো, ছদ্মবেশী রাজার মতো তাঁর এবারের আসা অতি সংগোপনে, লোকচক্ষুর অগোচরে, তবু যে-মানুষের মুহুর্মুহু সমাধি হয়, যিনি অর্ধবাহ্যদশায় অপরূপ নৃত্য করেন, দেবদুর্লভ কণ্ঠের গান শুনিয়ে সকলের চিত্ত হরণ করেন, তিনি যে আর পাঁচটা মানুষের মতো সাধারণ নন, একথাটা অতি বড়ো মূর্খও বুঝত। তা নইলে হিসেবি হাজরা মশাইয়ের দল সময়ে সময়ে তাঁর পায়ের ধুলো নেবার জন্য ব্যাকুল হতেন না।

ঠাকুরকে তাঁর অন্তরঙ্গেরা 'আপনি কি ভগবান'—একথা মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করেছিলেন কি না জানি না। তবে তাঁরা প্রত্যেকেই অন্তরের অন্তস্তলে উত্তরটা পেয়েছিলেন। অন্তর্যামী ঠাকুর তাঁদের বলতেন—তিনি কে, তাঁর সঙ্গে ভক্তের কী সম্পর্ক এইটে বুঝে নেওয়াই আশু কর্তব্য। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা যে যুগে যুগে অবতারের লীলাসঙ্গী, তাঁদের জীবন যে লোককল্যাণের জন্য, এসব তাঁরা দিনে দিনে অনুভব করে ধন্য হয়েছেন।

শ্রীশ্রীমার ক্ষেত্র কিন্তু স্বতন্ত্র। ঠাকুরের 'বিদ্যার ঐশ্বর্য' ছিল, ভাব-প্রেম-সমাধি—এসব বাহ্যপ্রকাশ ছিল, শ্রীশ্রীমার কিন্তু ঐশ্বর্যের লেশমাত্র নেই, নিতান্ত সাধারণ, গ্রামবাংলার এক রমণী! মায়ের কথা ও জীবনীতে একাধিকবার পাই ভক্তেরা সোজাসুজি জানতে চেয়েছেন তিনি কে—ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান হলে শ্রীমাও ভগবতী কি না। ভক্তদের বিভ্রান্তির প্রধান কারণ হল শ্রীমা তাঁর এবারকার লীলায় দেবীত্বের বাহ্যপ্রকাশগুলি সংবৃত করেই এসেছেন। ধনুকের টংকার নেই, শূলহাতে প্রচণ্ড আরাবে দুর্ধর্ষ অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধের ঘনঘটা নেই। একটাই তাঁর পরিচয়, তিনি মা। সন্তান আর কিছু না বুঝলেও নিজের মা বলে তাঁকে ঠিক বুঝে নিত। মহামায়া তাঁর 'আবরণশক্তি' দিয়ে নিজের স্বরূপকে এবার খুব নিপুণভাবে ঢেকেছেন, কারণ ঐশ্বর্য থাকলে সাধারণ দীনহীন অজ্ঞ 'পিঁপড়ের সার' মানুষগুলো তাঁর কাছে আসার সাহসই যে পাবে না!

এমন দুকূলব্যাপী মাতৃত্বের করুণামন্দাকিনী জাতপাত, সৎ-অসৎ সব ভেদদ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, এই মাতৃভাবই হবে এযুগে শ্রীশ্রীমার 'তারণ'-উপায়। 'মা' বলে ডাকলে তিনি কাউকে ফেরাতেন না। রোগশোক-মৃত্যুভয়দীর্ণ মানুষ তো এমনই এক অভয় আশ্রয় চায়! আপদে বিপদে 'আমার একজন মা আছেন'—এর চেয়ে বড়ো রক্ষাকবচ কী হতে পারে!

সেই মাকে উদয়াস্ত ভক্তসেবা, অতিথিসেবা, আত্মীয়পরিজনদের সেবায় নিরত দেখে ভক্তদের মধ্যে এক-আধজন তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন না করে পারেননি। কাশীতে একবার মায়ের দর্শনের জন্য ভক্তেরা এসেছেন। ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে মা তখন মহাব্যস্ত। এরই মধ্যে গোলাপ-মাকে শ্রীমা বলছেন, পরনের কাপড়টা একটু ছিঁড়ে গেছে, সেলাই করে দিতে। তা দেখে এক ভক্ত বলেই ফেললেন, ''মা, আপনি দেখছি ঘোর মায়ায় বদ্ধ।" অস্ফুটস্বরে মা বলছেন, ''কী করব মা, নিজেই মায়া!" আর একদিন একজন বলেই উঠলেন : ''মা, আপনার কেন এত আসক্তি? রাতদিন 'রাধি রাধি' করছেন ঘোর সংসারীর মতো। এগুলো কি ভালো?" এ ধরনের প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে অনেকসময় মা বলতেন, ''আমরা মেয়েমানুষ, আমরা এরকমই।" সেদিন কিন্তু মা ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, ''তুমি এরকম কোথায় পাবে? আমার মতো একটি বের করো দেখি। কি জান, যারা পরমার্থ খুব চিন্তা করে তাদের মন খুব সূক্ষ্ম শুদ্ধ হয়ে যায়। সেই মন যা ধরে, সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে। তাই আসক্তির

মতো মনে হয়। বিদ্যুৎ যখন চমকায় তখন শার্সিতে লাগে, খড়খড়িতে লাগে না।"

আবার কোনও ভক্তকে রেখে ঢেকে না বলে স্পষ্টভাষায় বলছেন : ''আমি সেই চিরপুরাতন—আদ্যাশক্তি জগন্মাতা, জগতকে কৃপা করতে আবির্ভূত হয়েছি, আবার আসব।" ঠিক যেন দানবদলনী মহামায়ার প্রসিদ্ধ আশ্বাসবাণী সাদা বাংলায় শুনছি। চণ্ডীতে ভগবতী দেবতাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন,

''ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥"

শ্রীরামকৃষ্ণের সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য তাঁকে সূর্যের মতো দ্যুতিমান করে তুলেছে। অন্যদিকে শ্রীমা যেন স্নিগ্ধ চন্দ্রমা, তাঁর ব্যক্তিত্ব বড়ো লাবণ্যময়, স্নিগ্ধ। ভাগবতের উপমা : চাঁদ দূর আকাশেই থাকে, জলে তার প্রতিবিম্ব দেখে মাছেরা ভাবে চাঁদ বুঝি তাদেরই খেলার সঙ্গী। শ্রীমায়ের ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই। তাঁর দেবীত্ব যদি তিনি প্রকাশ করতেন তাহলে অজ্ঞ, অশিক্ষিত, সাধারণ মানুষ ভয়ে তাঁর কাছেই ঘেঁষত না।

'ভগবন্ কা হি সা দেবী'—জিজ্ঞাসু-ভক্তের সেই অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণ একাধিকবার দিয়েছেন। আজ সে-উক্তিগুলি আমরা অনেকেই জানি কিন্তু তার মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করি না : ''ও সারদা সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।" ''ও কি যে সে, ও আমার শক্তি।" সেই ব্রহ্মজ্ঞানদাত্রী জননীকে আমরা চিনতে পারছি না কেন, তারও উত্তর ঠাকুরের কথাতেই পাই : ''রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয় তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।"

ঠাকুর শুধু মায়ের মহিমার কথা বলেননি, তাঁকে দেবীজ্ঞানে পূজা করেছেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রের ইতিহাসে সে এক নজিরবিহীন ঘটনা। ১৮৭২-এর জ্যৈষ্ঠমাস, ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রি। মন্দিরে মহাসমারোহে মা ভবতারিণীর বিশেষ পূজা হবে। ঠাকুরের ঘরেও নিভৃতে এক পূজার আয়োজন সুসম্পন্ন। ঠাকুরেরই নির্দেশে শ্রীমা রাত নটা নাগাদ এসে বসেছেন, একমনে পূজা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছেন। পূজারত ঠাকুর আলপনা আঁকা পিঁড়িতে এসে বসার জন্য মাকে আহ্বান জানালেন। তারপর পূজার বিধি অনুযায়ী একে একে নানা উপচারে মাকে পূজা করতে লাগলেন। মায়ের অভিষেক করে মন্ত্রোচ্চারণ, তারপর প্রার্থনা জানালেন : ''হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর। ইঁহার শরীর মনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূত হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।" পূজান্তে ঠাকুর মায়ের চরণে বারো বছরের সাধনার ফল, জপমালা সমর্পণ করে, ''হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণী, হে শরণদায়িনি, ত্রিনয়নি, শিবগেহিনি গৌরী, হে নারায়ণি তোমাকে প্রণাম করি"—বলে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানিয়েছিলেন।

সেই স্মরণীয় রাতে যখন মা কালীরই বিশেষ পূজার্চনা চলছে, তখন ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে কালীরূপে উপাসনা করবেন এটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীমার মধ্যে দশমহাবিদ্যার তৃতীয়া বিদ্যা ষোড়শীকে তিনি আবাহন করলেন। ষোড়শী ত্রিপুরসুন্দরী শ্রীকুলের দেবী, দাক্ষিণাত্যে ললিতাদেবীরূপে তাঁর বিশেষ পূজা। তিনি সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী, মোক্ষরূপিণী। নানা পুরাণে তাঁর রূপের বর্ণনা। ধ্যানমন্ত্রে আছে ত্রিপুরসুন্দরী 'বালার্কমণ্ডলাভাসা'—প্রভাতসূর্যের মতো উজ্জ্বল, রক্তাভবর্ণা, তিনি রাজরাজেশ্বরী, শ্রীবিদ্যা। তন্ত্রসাধনার সময় ঠাকুর ষোড়শীর দর্শনলাভ করে বলেছিলেন, এত রূপ আর কোনও দেবদেবীতে তিনি দেখেননি। কিন্তু ত্রিপুরসুন্দরীর বৈশিষ্ট্য তাঁর রূপমাধুর্য নয়, তিনি ব্রহ্মবিদ্যার অধীশ্বরী। আচার্য শংকর শৃঙ্গেরী মঠে শ্রীযন্ত্রে তাঁকে চিরকালের জন্য বেঁধে রেখেছেন। মণ্ডনপত্নী উভয়ভারতী ছিলেন সরস্বতীর অবতার। স্বামী সন্ন্যাসগ্রহণ করবেন শুনে তিনি দেহত্যাগ করতে চাইলে আচার্য তাঁকে সূক্ষ্মদেহে চিরকাল শৃঙ্গেরীতে অবস্থান করার অনুরোধ জানান।

দেবী ত্রিপুরার 'নিয়ন্ত্রী' বা 'সম্রাজ্ঞী' রূপটি লক্ষণীয়। পুরাণ বলছেন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তাঁর আসনের তিনটি স্তম্ভ। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের দেবতাদেরও নিয়ন্ত্রণ করছেন।

শ্রীশ্রীমাকে না চিনতে পেরে হৃদয় পাছে তাঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে অপরাধী হয় সেকথা ভেবে ঠাকুর বলেছিলেন, ''এর ভেতর যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস কিন্তু ওর ভেতরে

যে আছে সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবে না।" একসময় পাগলি মামির ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে শ্রীমাও বলেছেন, "আমি যদি তোকে মারি, দুনিয়ার এমন কেউ নেই যে তোকে রক্ষা করতে পারে। আর এতে আমার পাপও নেই, পুণ্যও নেই।" আদ্যাশক্তি পাপপুণ্যের অতীত। তিনি কর্মফলের অধীন নন, কর্মফলদাত্রী।

শ্রীশ্রীমায়ের স্বভাবের সঙ্গে 'ললিতাসহস্রনামে' বর্ণিত ললিতাদেবীর এক একটি বিশেষণের কী অদ্ভুত সাদৃশ্য! তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বলা হয়েছে : 'ওঁ আব্রহ্মকীটজনন্যৈ নমঃ'। মনে পড়ে যায় মায়ের অন্তরঙ্গ সেবক রাসবিহারী মহারাজ সামান্য একটি পিঁপড়েকে দেখিয়ে বলেছিলেন—তুমি কি ওরও মা? শ্রীমা সম্মতি জানিয়েছিলেন। আরও বলা হয়েছে : 'ওঁ করুণারসসাগরায়ৈ নমঃ,' 'ওঁ প্রেমরূপায়ৈ নমঃ।' শ্রীশ্রীমার অনন্ত করুণার কথা স্বামীজী স্বয়ং বলেছেন। মায়ের পা ছুঁয়ে তিনি প্রণাম করতেন না। বলতেন, "উনি এতই কৃপাময়ী, কোমলপ্রাণা, স্নেহাতুরা যে, কেউ ওঁর পাদস্পর্শ করলে উনি তৎক্ষণাৎ তার জ্বালাযন্ত্রণাকে টেনে নেন নিজের মধ্যে।" মায়ের অদ্ভুত তারণক্ষমতার পরিচয় পেয়ে স্বামী প্রেমানন্দও উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলেছিলেন, "যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি নে, সব মা-র নিকট চালান দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি—অপার করুণা!" এই ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী জননীর মহিমা ঠাকুরের সন্তানেরা তাঁদের নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে বোধে বোধ করেছেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শ্রীমাকে প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন : "মা উপরে রয়েছেন, আমি নিচের তলায় বসে। আমার হৃৎপদ্ম ফুটে উঠল।" স্বয়ং অবতার ও তাঁর ছেলেদের দুর্লভ অনুভূতি মায়ের মহিমার একটা চালচিত্র এঁকে দিয়েছে।

যে-সারদা সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছেন, ভববন্ধন থেকে মুক্ত করতে এসেছেন তাঁকে এযুগে আজ বড়ো প্রয়োজন। নিবেদিতা বলছেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের পাত্রী—তিনি প্রাচীন ও নবীনের সংযোগকারিণী মহাশক্তি। আমাদের মনে হয় জ্ঞানদাত্রী দেবী সারদাকে ঘিরে আছে এক অদ্ভুত পবিত্রতা। সে-পবিত্রতা তাঁর শান্ত স্থির দৃষ্টিতে, তাঁর সম্রাজ্ঞীর মতো গম্ভীর মর্যাদাময় ব্যক্তিত্বে, তাঁর প্রতিটি আচার-আচরণ, সংলাপে। আজ মায়ের তেজস্বিতা, দার্ঢ্য ও নিয়ন্ত্রণ করার অপূর্ব শক্তি নারীচরিত্র গঠনে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে—মা আদর্শের প্রাচীন প্রতিমা নন, নবযুগ মন্থন করে তোলা এক অদ্ভুত কোমল অথচ বজ্রের মতো কঠিন উপাদানে তৈরি মাতৃমূর্তি। স্বামীজী কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন : মেয়েরা প্যানপ্যানে ভাবই শিক্ষা করেছে। তাদের আত্মরক্ষায়ও শিক্ষিত করা প্রয়োজন। না, মায়ের জীবনে নারীসুলভ দৈন্য, কাতরতা ও ভেঙে পড়ার কোনও ছবিই চোখে পড়ে না। বরং দেখি অপূর্ব সংযম ও ত্যাগের মহিমা। আজ নারীপ্রগতি, নারীস্বাধীনতার প্রসঙ্গে মেয়েরা সোচ্চার। যে-প্রগতির নমুনা পাই তার অনেকটাই বাহ্যিক, বেপরোয়া, বাণিজ্যিক। শ্রীমা কিন্তু নারীমাত্রের সহজাত দৈবী শক্তি—লজ্জা, তুষ্টি, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, শান্তি ইত্যাদি কোনওটাকেই বাদ দেননি—তিনি জানতেন, নারীর অন্তর্নিহিত দেবীত্বের পূর্ণবিকাশেই তার সার্থকতা। প্রত্যেক মেয়ে যদি আপন দেবীত্বের প্রকাশ ঘটাতে পারে, জগতের চেহারাটাই বদলে যাবে। নারীর জ্ঞানদাত্রী চৈতন্যময়ী রূপের শেষকথা শ্রীশ্রীমা। তাঁকে জীবনে গ্রহণ করার অর্থ নিজেদের মধ্যে সেই শুদ্ধ মাতৃশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর ভাবে নিজেদের গড়ে তোলার চেষ্টাই তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্দনা।

সিদ্ধবিদ্যা বগলা ত্রিপুরসুন্দরীর অঙ্গের তেজ থেকে উৎপন্না। এই তেজ শ্রীবিদ্যাসম্ভূত তেজ। নারীচরিত্রের কোমলতার সঙ্গে দার্ঢ্য এযুগের মেয়েদের বিশেষ প্রয়োজন। স্বামীজী শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপপ্রসঙ্গে বলতেন, "বগলার অবতার। সরস্বতীমূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা, উপরে মহাশান্তভাব কিন্তু ভিতরে সংহারমূর্তি।" শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদদের উক্তি থেকে মায়ের দিব্যচরিত্রের মহিমা শুনে আমরা তা কতটা হৃদয়ংগম করতে পারি জানি না, শুধু জানি আমরা তাঁদের অভয় আশ্রয়প্রার্থী, শরণাগত। অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির মতো যাঁরা চির অভিন্ন, শব্দ ও তার অর্থের মতো যাঁরা নিত্য সংশ্লিষ্ট, সেই জগতঃ পিতরৌ বন্দে সারদা-পরমেশ্বরৌ।